মাৎস্যন্যায়

দেশ এখন যাচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের দিকে। এদেশের মানুষ ধার্মিক, ধর্মান্ধ নয়। তারা বিএনপিকে ভোট দেয় একই কারণে। বিএনপি যদি দেশ শাসন, পুলিশ সব ছেড়ে দেয় জামায়াতি ইচ্ছের ওপর তখন দেশের যে সর্বনাশ ঘটবে তার দায়িত্ব অন্য কেউ নেবে না, নিতে হবে বিএনপিকে। শেষ রক্ষার সুযোগ এখনো হয়তো আছে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

ছোট এবং বড় মাছের অবস্থান একই সঙ্গে হতে পারে। এক্ষেত্রে বসবাস যে সব সময় শান্তিপূর্ণ হয়, তেমন নয়। মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত বড় মাছ খেয়ে ফেলে ছোট মাছকে। কখনো কখনো আবার উল্টো ঘটনাও ঘটে। ছোট মাছ বড় মাছের পাশাপাশি থাকতে গিয়ে নানা কৌশল অবলম্বন করে। বুদ্ধি করে নিজের শক্তি এবং বুদ্ধি। বড় মাছ ছোট মাছের এই কৌশল আঁচ করতে পারে না। অথবা আঁচ করতে চায় না। বড় মাছের দাম্ভিকতা এবং নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ছোট মাছ। এক পর্যায়ে গিয়ে আক্রমণ করে বড় মাছকে। তখন অসহায়ের মতো বড় মাছ ঢুকে যায় ছোট মাছের পেটে। ইতিহাসে এর নজির আছে। দুর্যোগময় সময়কালে ঘটে এমনটা।

এমন একটা সময় বাংলাদেশে আগেও এসেছিল।

৬৫০ থেকে ৭৫০ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়ের শত

বছর। এই একশ' বছর ছোটকে বড় গ্রাস করেছে। ইতিহাসে যা পাওয়া যায় তা হলো হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর এ অঞ্চলের কারো শক্তিশালী প্রশাসন না থাকায় চীন-তিব্বত-কামরূপ রাজবংশ স্থানীয় সামন্তবর্গকে হাত করে তাদের রাষ্ট্রসীমা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতো। এ সালের মেঘাচ্ছন্নতা, ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে ইতিহাস বলে 'মাৎস্যন্যায়'। ছোটকে বড় গ্রাস করা। ছোট চাষী বড় চাষীকে, ছোট রাজা বড় রাজাকে গলাধঃকরণ করেছে। বাংলাদেশে এখন সেই মাৎস্যন্যায় প্রক্রিয়া চলছে। মাৎস্যন্যায়ের আমলে ছোট রাজা আরো কিছু ছোট রাজাকে একত্রিত করে বড় রাজাকে আক্রমণ করতো। এখন বাংলাদেশে সেই ভয়াবহ মাৎস্যন্যায় শুরু হয়েছে। ছোট নেতা বড় নেতা মেরে নিজে বড় হচ্ছে। ছোট সন্ত্রাসী হত্যা করছে বড় সন্ত্রাসীকে। নিজে বড় হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। এক দলের ক্যাডার অন্যদলের ক্যাডার মারছে। শরিক দল নিজেদের ভেতরে মেরুকরণ করছে। প্রশাসনকে প্রভাবিত করে দল ভারী করছে। প্রশাসনকে দলীয়করণ করছে। যা বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে ধর্ম রাষ্ট্রের দিকে, যা জনগণের নির্বাচন রায়ের বিপরীতে। বিএনপি মাৎস্যন্যায়ের মত হানাহানির দিকে দেশকে নিয়ে গেছে। বিএনপি নিজেই মাৎস্যন্যায়ের শিকার হতে যাচ্ছে।

আমাদের রাজনীতির ছোট মাছ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। নামের শেষে 'বাংলাদেশ' ব্যবহার করলেও বাংলাদেশের অস্তিত্বে তারা এখনো বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ আছে। আর বড় মাছ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল দু'টির একটি বিএনপি। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পর অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচনের দু'টিতে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি। এর থেকেও দলটির বিশালত্ব বোঝা যায়। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপির একটা সম্পর্ক জন্মের সময় থেকেই। এরজন্য বিএনপিকে অনেক সমালোচনাও শুনতে হয়। তবে '৯৬ সালে জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলে, সাধারণ মানুষের কাছে এই সমালোচনা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির সুযোগে তৈরি হয় চারদলীয় জোট। ২০০১ সালের নির্বাচনে ব্রুট মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় আসে তারা। এখানে বুঝতে হবে মানুষ ভোট দিয়েছে মূলত বিএনপিকে। ভোট জিয়ার ধানের শীষে, ধর্মীয় রাজনীতির পক্ষে নয়। ক্ষমতায় এসেই জামায়াত কৃষি এবং সমাজ কল্যাণের মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় গুছিয়ে নেয়। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে এ দুটি মন্ত্রণালয়ের গ্রাম কেন্দ্রিক সংগঠন রয়েছে। এই মন্ত্রণালয় দুটির ওপর নির্ভর করে বাড়তে থাকে তাদের শাখা প্রশাখা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে জামায়াত পৌঁছে যেতে থাকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। কৃষি বিষয়ক সব কিছুতে জামায়াত-শিবিরের নেতা-ক্যাডাররা হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা। ব্যাংক ঋণ, সার, কীটনাশক, খাদ্য ক্রয়... সবকিছুই দখল করে নিতে থাকে জামায়াত। বিএনপি'র নেতাকর্মীদের কোনো ভূমিকা থাকে না। তারা অসহায়ের মতো সব কিছু দেখতে থাকে। সচিবালয়ের নিজামীর কৃষি মন্ত্রণালয় হয়ে ওঠে জামায়াত-শিবিরের প্রধান অফিস।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত জামায়াত মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদ কাজ করতে থাকে তার মতো করে। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এনজিওদের বিরুদ্ধে নিতে থাকে কঠোর ব্যবস্থা। জামায়াত-শিবিরের নেতা-ক্যাডার-সমর্থকরা হয়ে উঠতে থাকে এনজিও ব্যক্তিত্ব। জন্ম হয় নতুন অনেক নামসর্বস্ব এনজিওর। বিদেশী অর্থে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে তারা। এই এনজিওগুলো নিয়মিত অর্থ পাচ্ছে। পাশাপাশি দেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য ছোট এবং বড় একটি এনজিও পড়ে গেছে মহাসংকটে। এমনি একটি বড় এনজিও বলতে বোঝাতে চাইছি প্রশিকাকে। যদিও প্রশিকা নিজেই নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। অতিবিপ্লবী ভূমিকা নিতে গিয়ে প্রশিকা প্রধান কাজী ফারুক নিজে বিতর্কিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানকেও বিতর্কিত করে তুলেছেন। আর এই সুযোগেই প্রশিকা বন্ধ করে দেয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে জামায়াত মন্ত্রী মুজাহিদ। শুধু প্রশিকা নয়। দেশ জুড়ে এনজিও যারা গ্রামে গ্রামে একটি সমন্বয় তৈরি করেছে তারা থমকে গেছে এই মন্ত্রণালয়ের দাপটে। প্রশিকার বিরুদ্ধে একটি দলের পক্ষে রাজনীতি করার অভিযোগ আছে। কিন্তু সারা দেশের ছোট ছোট এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ নেই। তাহলে তাদেরকে এভাবে দমন করা হচ্ছে কেন? কারণ নব্বইয়ের দশক থেকে এনজিও সেক্টরে প্রচুর সংখ্যক বামপন্থীদের আগমন ঘটেছে। আগে যারা বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তারাই এখন জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে ছোট ছোট এনজিও পরিচালনা করছে। এই বামদের বিতাড়ন করে জামায়াতের নেতা-ক্যাডারদের পুনর্বাসনই আলী আহসান মুজাহিদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই সে কাজ করছে।

বাংলা ভাইকে প্রোটেকশনের নির্দেশ যদি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে দেয়া হয়, তাহলে কেন দেয়া হয়েছে সেটার একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন এমন কাউকে পুলিশ পাহারা দেবে, সেটা দেশের প্রচলিত আইনের কোন ধারায় পড়ে, সেটা জানার অধিকার নিশ্চয় দেশবাসীর আছে ...

ছোট এনজিওগুলো যে শুধু বামরা পরিচালনা করছে তাও নয়। এরমধ্যে বিএনপির অনেক লোকজনও আছেন। তারাও জামায়াত দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। জামায়াতের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে নিজামী-মুজাহিদদের মধ্য দিয়ে। অথচ এ দু'জনই '৭১-এ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খলনায়ক।

একটু দেরিতে হলেও বিএনপি'র কিছুটা বোধোদয় হয়ত হয়েছে। তাই নিজামীকে সরানো হয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে। এনজিও ব্যুরোকেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক করা হয়েছে।

যাদের শক্তি কম তাদের বুদ্ধি বেশি রাখতে হয়। শক্তিকে তারা মোকাবেলা করে বুদ্ধি দিয়ে। জামায়াত-বিএনপির ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। অপকর্ম করছে জামায়াত। কিন্তু দায় পড়ছে বিএনপির কাঁধে।

রাজশাহীর বাগমারায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে 'বাংলা ভাই'। বাংলা ভাইয়ের পুরো নাম ওমর আলী লিটু। যদিও তার বাবা-মায়ের দেয়া নাম সিদ্দিকুর রহমান। সে পড়াশোনা করেছে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে। কলেজে সে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডার হিসেবে পরিচিত ছিল। তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসার পর এক বছর বাংলা ভাই কোথায় ছিলো জানা যায় না। ধারণা করা হয় এই সময় সে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিলে। কান্দাহারে ট্রেনিং নিয়েছে। আফগানিস্তানে গিয়েই সে বাংলা ভাই নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। তালেবানদের পতনের পর ফিরে এসেছে বাংলাদেশে। বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাসী

কর্মকান্ডে রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ অতিষ্ঠ। সর্বহারা নিধনের নামে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে সন্ত্রাস করছে বাংলা ভাইয়ের বাহিনী। সন্দেহ নেই রাজশাহীর এই অঞ্চলগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে সর্বহারা সন্ত্রাস চলছে। পড়ছে লাশ, ঝরছে অশ্রু। মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। এর দায়িত্ব পুলিশের, সরকারের। কোনো দলের বা ব্যক্তির নয়।

যে কোনো রকমের সন্ত্রাসের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি- জোট সরকার। কিন্তু সরকার সন্ত্রাস নির্মূল করবে কীভাবে? বাংলা ভাইয়ের মাধ্যমে? সন্ত্রাসের রূপান্তর আর সন্ত্রাস নির্মূল যে এক কথা নয় সেটা কী বিএনপি নেতা মন্ত্রীরা বোঝেন না? সন্ত্রাসী জংলি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলা ভাই। সে জামায়াত-শিবিরের সদস্য। তার কর্মকান্ডে দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ইতিমধ্যে অনেকটা ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। দাতা-গোষ্ঠীও এই বাংলা ভাইকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রশ্ন তুলেছে প্রশিকাকে নিয়ে। জামায়াতের সব দায় নিতে হচ্ছে বিএনপিকে। কিন্তু শেষ ফল বিএনপি কিছু পাবে না।

তবুও রহস্যজনকভাবে বাংলা ভাইকে নিয়ে নীরব নিশ্চুপ বিএনপি নেতা মন্ত্রীরা। তারা কোনো কথা বলছে না। অথচ নিশ্চুপ নয় জামায়াত। শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছে, 'বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে জামায়াতের কোনো সম্পর্ক নেই।'

জামায়াত-শিবির চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী নাছির, কক্সবাজারের ডালিমরা ধরা পড়লেও তারা একই বক্তব্য দেয়। বাংলা ভাই সম্পর্কে বক্তব্য দিয়ে জামায়াত পরিষ্কার হয়ে গেছে। অথচ জামায়াত-শিবির ক্যাডার বাংলা ভাইকে পুলিশ প্রহরায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার সুযোগ করে দিয়েছে প্রশাসন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়। হয়তো বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হবেও। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে থাকলেও নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো নির্দেশ, দেরিতে হলেও। গ্রেপ্তারের নির্দেশ কে দিলেন সেটা জানা গেল। কিন্তু বাংলা ভাইকে প্রোটেকশন দেয়ার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন? কারা দিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর কী কোনোদিন পাওয়া যাবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে প্রশংসিত হতেন।

বাংলা ভাইকে প্রোটেকশনের নির্দেশ যদি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে দেয়া হয়, তাহলে কেন দেয়া হয়েছে সেটার একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন এমন কাউকে পুলিশ পাহারা দেবে, সেটা দেশের প্রচলিত আইনের কোন ধারায় পড়ে, সেটা জানার অধিকার নিশ্চয় দেশবাসীর আছে।

বাংলা ভাই নিজেই স্বীকার করেছে উপমন্ত্রী দুলু, রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়াসহ অনেকের সঙ্গে সে মিটিং করেছে। এরা সবাই তাকে সহযোগিতা করছে। সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে নাম আসছে বিএনপির নেতা, মন্ত্রী এবং পুলিশের। প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন এক্ষেত্রে কোনো জামায়াত নেতার নাম আসছে না। অথচ বাংলা ভাই জামায়াত-শিবিরের ক্যাডার। গ্রামীণ সেই প্রবাদ 'চালাকে খায় কাঁঠাল বব্বরের মুখে আঠা'। রাজশাহীর এই অঞ্চলে সর্বহারা সন্ত্রাস যেমন আছে, তেমনি বামধারার রাজনীতিও আছে। জামায়াতের টার্গেট এই বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তদের বিতাড়িত করা। সেই টার্গেটের অংশ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে বাংলা ভাই। গঠন করেছে সন্ত্রাস বাহিনী। জামায়াতের পরিকল্পনা অনুযায়ী এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কাজ করবে। ইমেজে ধস নামবে বিএনপির, খালেদা জিয়ার। আর সুবিধার পুরোটাই যাবে জামায়াতের ঘরে।

বিএনপির রাজনীতির অবস্থা এখন এতটাই করুণ। ত্যাগী নেতাকর্মীরা নিষ্ক্রিয়। নব্যরা ব্যস্ত আখের গোছাতে। গাজীপুরে নিহত হলেন আওয়ামী লীগ এমপি আহসান উল্লাহ মাস্টার। এই হত্যাকান্ডটি নিয়ে অত্যন্ত জগাখিচুড়ি রাজনীতি করেছে বিএনপি। হত্যাকান্ড ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ সরকার প্রচার করতে চেয়েছে দলীয় কোন্দলে নিহত হয়েছেন আহসান উল্লাহ মাস্টার। কোনো রকম তদন্তের আগে সরকারের এই কান্ডজ্ঞানহীন ভাষ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে জনমনে। জনমনে কতগুলো কথা উঠেছিল তার মিথস্ক্রিয়া চলছিল এর মধ্যে সরকারের বক্তব্য মানুষকে রহস্য থেকে বের করে বৈরী করে তোলে।

আহসান উল্লাহ মাস্টার শুধু একজন আওয়ামী লীগ নেতা বা এমপি নন। তিনি সৎ রাজনীতিকের মডেল। সারা জীবন সৎভাবে জীবনযাপন করে গেছেন। এই জীবন যাপনই তাকে এনে দিয়েছিল ব্যাপক জনপ্রিয়তা।

ঢাকাসহ ঢাকার চারপাশের সবগুলো শহর বিএনপির দখলে। ব্যতিক্রম টঙ্গী-গাজীপুর। কারণ আহসান উল্লাহ মাস্টারের জনপ্রিয়তা। তিনি জীবিত থাকতে এই এলাকায় বিএনপির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে কারণে স্থানীয় বিএনপি নেতা-ক্যাডাররা সহ্য করতে পারতো না আহসান উল্লাহ মাস্টারকে। তবে আহসান উল্লাহ মাস্টার কাদের হাতে নিহত হয়েছেন সেটা আমরা জানি না। তদন্তের আগে সেটা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার কীভাবে তদন্তের আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অবান্তর মন্তব্য করে? এটা কী আমাদের রাজনীতিবিদদের জাতীয় চরিত্র? ক্ষমতার শেখ হাসিনাও কথা বলতেন একই সুরে!

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বিএনপিতে এখন রাজনীতি নেই, সর্বত্র ব্যবসা। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে চলছে ব্যবসা। সবাই ব্যস্ত ব্যবসা নিয়েই। আর রাজনীতি করছে জামায়াত। সরকারি প্রশাসনের সুবিধা নিয়ে বিস্তার ঘটছে জামায়াতের। ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বিএনপি।

জোট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মতিউর রহমান নিজামী। সে সম্প্রতি 'সূর্যসেন'কে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করেছে। সূর্যসেন কে, তার পরিচিতি কী- এটা জানা থাকার কথা বিএনপির অনেক নেতা মন্ত্রীর। ইতিহাসে সূর্যসেনের একটি স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। নিজামীর মতো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী একজন তাকে কী বলল সেটা দিয়ে ইতিহাসে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তাই নিজামীর কথাটি গুরুত্ব না দিলেও চলে। তাদের পক্ষে এ ধরনের কথা বলাটাই স্বাভাবিক। '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধাদের নিজামীরা বলত সন্ত্রাসী। তারা সূর্যসেনকে সন্ত্রাসী বলবে এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। [কয়েকদিনের মধ্যে জিয়াকে সন্ত্রাসী বা বিদ্রোহী সেনা বলার ক্ষমতা পাবে!] কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা কী শুধুই নিজামীর বক্তব্য? নাকি জোট সরকারের বক্তব্য? সরকারি ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, সচেতন মানুষ ধরেই নেবে এটা জোট সরকারের বক্তব্য। সরকারের প্ল্যাটফর্ম থেকেই বলা হয়েছে। এই সচেতন জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ ভোট দেয় বিএনপিকে। এরা কখনো জামায়াতকে ভোট দেয় না। তাই এদের মনে আঘাত দিয়ে কথা

এই সচেতন জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ ভোট দেয় বিএনপিকে। এরা কখনো জামায়াতকে ভোট দেয় না। তাই এদের মনে আঘাত দিয়ে কথা বললে জামায়াতের কোনো ক্ষতি নেই। ক্ষতি আছে বিএনপি'র। বিএনপি এটা বুঝতে না পারলেও জামায়াত এটা করছে সচেতনভাবেই ...

বললে জামায়াতের কোনো ক্ষতি নেই। ক্ষতি আছে বিএনপি'র। বিএনপি এটা বুঝতে না পারলেও জামায়াত এটা করছে সচেতনভাবেই।

হুমায়ুন আজাদ হত্যা প্রচেষ্টা নিয়ে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সরকার বলেছিল আক্রমণকারীদের ধরে বিচার করা হবে। হুমায়ুন আজাদ নিজে বলেছেন মতিউর রহমান নিজামী এবং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ধরলে জানা যাবে কারা তার ওপর আক্রমণ করেছিল। এক্ষেত্রেও সরকারের কোনো ভূমিকা বা বক্তব্য নেই।

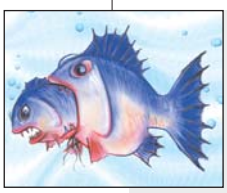

যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন সেই সরকারের ছাত্র সংগঠন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পুলিশি শেল্টারে দখল, সন্ত্রাস করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হয় বিএনপি সরকারের সময়কালে। কিছুদিন আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ হলো ছাত্রদল-শিবিরের মধ্যে। পুলিশ পক্ষ নিল শিবিরের। বেদম মার খেয়ে ক্যাম্পাস ছাড়া হলো ছাত্রদল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো অনেক স্থানে এরকম ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে। বিএনপি'র মার খেয়ে হজম ক্ষমতা বেড়ে গেছে।

২০০১ সালের বিপুল বিজয় বিএনপিকে দাম্ভিক করে তুলেছে। তারা কোনো কিছুকেই এখন আর গুরুত্বের মধ্যে আনতে চায় না। বিএনপি এখন চায় সবাই তাদের অনুগত হয়ে থাকবে। তাদের এমন মানসিকতার কারণ ভোটের সমীকরণ। বিএনপি এবং জামায়াতের ভোট একত্র হলে আওয়ামী লীগের ভোটের চেয়ে বেশি হয়। এককভাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করলে কোনোভাবেই বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। বিএনপি এমনটাই চিন্তা করে। এ ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে যুক্তিও আছে। এ কারণে বিএনপি কোনোভাবেই চায় না জামায়াত জোট থেকে বের হয়ে যাক। যে কোনো উপায়ে জামায়াতকে জোটে রাখতে চায় বিএনপি। এর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবই করা হবে। এই সুযোগে আকার-আকৃতিতে বেড়ে উঠছে জামায়াত। সর্বনাশ হচ্ছে বাংলাদেশের।

জামায়াত একই প্ল্যাটফরম থেকে রাজনীতি করছে অন্যদিকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে দিয়ে বিতর্কিত ফতোয়াবাজি করিয়ে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। চুনোপুঁটি অন্য দুটি দলে দুই জোকারকে দিয়ে কোথায় কোন ড্রিঙ্কসে কি পরিমাণে অ্যালকোহল আছে তার পরিমাপ করাচ্ছে। এই দু'জোকারের মতানুসারে সেটা বাজার থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে। গ্রামেগঞ্জে যাত্রাপালা, গান, মেলা, নাটক শিবির-পুলিশের সহায়তায় বন্ধ করছে, ফতোয়া দিয়ে বন্ধ করছে। জামায়াতের পছন্দ নয় বলে হজরত শাহজালালের মাজারের মাছ মারা যায়, বায়েজিদ বোস্তামির কাছিম মারা যায়। ক'দিন পর দেখবো খুলনা খান জাহান আলীর পুকুরেও বিষ দেয়া হয়েছে। সব কিছুকে একই দিকে নেয়া হচ্ছে।

জোট সরকার জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসী বাংলা ভাইদের শেল্টার দেয়া অব্যাহত রাখলে ভোটের সমীকরণে কী পরিবর্তন আসবে না? আত্মবিশ্বাসী থাকা ভালো। তবে বিএনপি এখন যতটা আছে ততটা থাকা সম্ভবত ভালো নয় ...

ইংরেজি নববর্ষ পালন করে সারা বিশ্বের সঙ্গে বাঙালীরাও। কক্সবাজারে বিদেশী পর্যটকসহ দেশী লোকজন ঢাকা থেকে গিয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর। কি হলো, পুলিশ বন্ধ করলো থার্টি ফার্স্ট। ঢাকা থেকে নির্দেশ এলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। কারণ শাইখুল হাদিস, শিবিররা গন্ডগোল করতে পারে। তাই যদি হয় সরকার সংসদে পাস করবে থার্টি ফার্স্ট করা যাবে না। তা যদি না হয় অন্য কেউ গন্ডগোল করবে, বন্দুক কামান নিয়ে আসবে তখন গন্ডগোলকারী, আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ তাদের প্রতিহত করে, রাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ রাখবে এটাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তা না করে দেশী-বিদেশীদের সরে যেতে বলা হলো। যারা আপত্তি করলো তাদের করা হলো গ্রেপ্তার। একটি অনুষ্ঠান যদি শাইখুল হাদিস বা অন্য জোকারের পছন্দ না হয় তারা বলে আমরা লাঠি নিয়ে আসবো। পুলিশ সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নিয়ে অনুষ্ঠান অবৈধ ঘোষণা করছে। এটা কোন জংলি আইন? জামায়াত সরকারে থেকেই দু'জোকার ও দলের শক্তি দিয়ে কাদিয়ানি বিরোধী আক্রমণ চালালো। জামায়াত বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চায়। সেদিকেই এগুচ্ছে জামায়াত বিএনপিকে সাঙ্গাত বানিয়ে।

ভোটের সমীকরণের যে হিসাব বিএনপি করছে, সেটা সত্যি। কিন্তু সব সময়ই কী এই সমীকরণ অপরিবর্তিত থাকবে? পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে চোখ ফেরালে কিন্তু তেমনটা মনে হয় না। বিজেপি মনে করেছিল নির্বাচনে জিতে তারা আবার ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। ভারতের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক উন্নয়নের পরেও মানুষ ভোট দেয়নি বিজেপিকে। মানুষের এমন আচরণের কারণ গবেষকদের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ভারতের মানুষ কেন বিজেপিকে ভোট দেয়নি, তার অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে অন্যতম মানুষের উপলব্ধি। দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ধর্মান্ধ মৌলবাদী একটি রাজনৈতিক দল- এটাকে ভারতবাসী নিজেদের জন্য অসম্মানজনক মনে করেছে। আদভানি, বাল থ্যাকারেদের গুজরাট ধ্বংসযজ্ঞই এর মূলে চালিকাশক্তির কাজ করেছে। সাইনিং ইন্ডিয়ার সঙ্গে ধর্মীয় পার্টি মানায় না।

জোট সরকার জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসী বাংলা ভাইদের শেল্টার দেয়া অব্যাহত রাখলে ভোটের সমীকরণে কী পরিবর্তন আসবে না? আত্মবিশ্বাসী থাকা ভালো। তবে বিএনপি এখন যতটা আছে ততটা থাকা সম্ভবত ভালো নয়। একথা সত্যি যে, মানুষ আওয়ামী লীগের ওপরও আস্থা রাখতে পারছে না। তৃতীয় শক্তি হিসেবে যাদের কথা আলোচিত হচ্ছে তারা আসলে কোনো শক্তি নয়। তবে মানুষের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে, সন্ত্রাস তার জীবনকে জাপটে ধরলে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে। নিজামীরা এখনো মাঝে-মধ্যেই বলে, আমরা সরকারের ব্যর্থতার দায়িত্ব নেব না। বাস্তবেও তাই হবে। বিএনপি'র থেকে যতটা সুবিধা নেয়ার তার চেয়ে অনেক বেশি নিচ্ছে জামায়াত। ছোট মাছ ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। এখন যেভাবে চলছে, সেভাবে আগামী দু'বছর চললে জামায়াত আর 'ছোট' থাকবে না। আকৃতিতে ছোট থাকলেও কার্যক্রমে বড় হয়ে যাবে। এখন শিবির আক্রমণ করে ছাত্রদলকে। তখন জামায়াত আক্রমণ করবে বিএনপিকে। অথবা বিএনপি আর বিএনপি থাকবে না। জামায়াতের আদর্শই হয়ে যাবে বিএনপি'র আদর্শ। বিএনপির প্রগতিশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদরা এখনি সচেতন না হলে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হবে। বর্তমান বিএনপিকে মানুষ মৌলবাদী রাজনৈতিক দল মনে করে না। কিন্তু দু'বছর পরের বিএনপিকে মানুষ মৌলবাদী রাজনৈতিক দল ভাবতে বাধ্য হবে।

উপমহাদেশের মানুষ ধর্মীয় গোঁড়া মৌলবাদীদের পছন্দ করে না। এটা '৭১-এ বড়ভাবে একবার প্রমাণ হয়েছিল। ভারতে সম্প্রতি প্রমাণ হলো। বাংলাদেশেও এটা সব সময় প্রমাণ হয়ে আসছে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা কখনো জনগণের ভোট পায় না। গত নির্বাচনে চারদলীয় জোট ভোট পেয়েছে বিএনপি'র কারণে। মানুষ বিশ্বাস করে যে বিএনপিকে ভোট দিয়েছে, সেই বিএনপি হয়ে উঠেছে মৌলবাদের খোরাক।